***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 127 – 135*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848*

# প্রচেত গুপ্তের নির্বাচিত গল্পের আলোকে মনের গহন প্রদেশের উন্মোচন

শিল্পা ঘোষ
ইমেইল : shilpag091@gmail.com

## Keyword
মনের জটিলতা, চেতন, অচেতন, আত্মকেন্দ্রিক জীবন, অবসাদ, মনঃসমীক্ষণ, গভীর পর্যবেক্ষণ।

## Abstract
সাহিত্য সমাজের দর্পণ তেমনি আবার ব্যক্তিমনেরও দর্পণ বটে। সমাজের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সমাজ অধ্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এর সাথে মানব মনের, দ্বন্দ্ব, আঘাত, জিজ্ঞাসা, চেতনা, অচেতনা, কামনাবাসনা, অবদমিত চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে লেখকের কলমের নিপুণ টানে। গল্পকার প্রচেত গুপ্তের গল্পেও মানব মনের অতলান্ত রহস্যের অচেনা জগতের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মানব মনের অচেনার দিকটি তুলে ধরেছেন।

তবে মানসিক অবসাদ, অস্থিরতা, জটিলতাকে সাহিত্যে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে অনেক আগে থেকেই। বিভিন্ন সাহিত্য শাখার হাত ধরে ছোটগল্পেও তা এসে পৌঁছেছে। সচেতন ভাবে এর প্রয়োগ ঘটেছে মূলত বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এর মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে। ইতিপূর্বে মনোজগতের বিষয় সাহিত্যে আনুষঙ্গিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যথাযথ ভাবে এর ব্যবহার দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখের হাত ধরে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্য ধারায় প্রচেত গুপ্ত এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পাকাপাকি ভাবে তাঁর সাহিত্যজগতে আবির্ভাব। তাঁর সাংবাদিক অভিজ্ঞতা প্রসূত লেখনী, সহজ সরল উপস্থাপন অথচ গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁকে সাহিত্যধারায় পৃথক আসন প্রদান করেছে। আপাত সহজ বিষয় অবলম্বনে রচিত গল্প দেখলে মনে হতে পারে যে তা অনুকরণযোগ্য, আমরা সবাই এমন লিখতে পারি। কিন্তু তলিয়ে দেখলে এর গভীরতা অনুভব করা যায়।

প্রচেত গুপ্ত মনের অন্দরমহলের অজানার ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ছোটগল্পে এর কারণ তুলে ধরতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলি যারা এ সমস্যার সম্মুখীন তারা বুঝেও কিছু করতে পারছে না ডুবে যাচ্ছে অতলান্ত যন্ত্রণায়। বর্তমান সময়ে আত্মকেন্দ্রিক জীবন, সামাজিক অবক্ষয়, হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা মানুষকে সংকটময় আবর্তে জড়িয়ে ফেলছে এবং মনের অজান্তেই জন্ম নিচ্ছে নানা বিকৃত ভাবনা ও বাসনা। গল্পে চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে লেখক তা তুলে ধরেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এর থেকে উত্তরণ আছে কি নেই তা জানার, খোঁজার

চেষ্টাও যেন ব্যর্থ হয়ে উঠেছে। এ ভাবনাই লেখকের 'কুঞ্জবিহারীর দুঃস্বপ্ন', 'দিঘি', 'তালিকা', 'ফ্লাইওভার' প্রভৃতি গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে।

তাই এ কথা বলা যায়, লেখক প্রচেত গুপ্ত তাঁর চুলচেরা বিশ্লেষণ এর সাহায্যে মানবমনের অন্তর্জাত ভাবনাকে গহন প্রদেশে লুকিয়ে থাকা অনিয়ন্ত্রিত বিষয় গুলিকে সহৃদয় দৃষ্টিতে উপলব্ধি করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

## Discussion

**ভুমিকা :** জীবনানন্দ দাশ 'বোধ' কবিতায় বলেছেন-

"সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা
আমার পথেই শুধু বাঁধা?"[১]

মানব মন এর অবস্থান কোথায় তার আকার আয়তন কেমন বা এর নির্দিষ্ট পরিচয় কি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। মন বিষয়ক মনোবিদ্যা শাখা স্বয়ং এর সুসম্পূর্ণ ধারণা দিতে অক্ষম। আসলে মানবমনের তথাকথিত নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ আমরা এর দ্বারা অনেকাংশে চালিত। অনেক সময় আমরা যা ভাবি আর যা করি তাতে অনেক তফাৎ দেখা যায় যা কোন কার্যকারণ সম্পর্কে ধরা যায় না। মানবমনের এ ধরনের জটিল গতিবিধি নিয়ে গল্প লিখেছেন গল্পকার প্রচেত গুপ্ত।

প্রচেত গুপ্ত একাধারে সাংবাদিক ও লেখক ১৪ই অক্টোবর ১৯৬২ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে মূলত একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন –

> "আমার গল্পের বইয়ের সংখ্যা বেশি নয়। নীল আলোর ফুল, পঞ্চাশটি গল্প, প্রিয় বান্ধবীকে, রূপোর খাঁচা, আশ্চর্য পুকুর।"[২]

এছাড়া রয়েছে 'প্রচেত গুপ্তর গল্প', 'চাঁদ পড়ে আছে','রাতে পড়বেন না', ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ। এত কম সময় ধরে লিখেও পাঠক মনে তিনি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন।

বাংলা ছোটগল্প ধারায় প্রচেত গুপ্তের আগেও মানবমনের জটিলতাকে ঘিরে নানারকম গল্প নানা সময়ে লিখিত হয়েছে। মূলত বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মান মনোবিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) এর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর সাহিত্যক্ষেত্রে তা যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল। মানব মনকে জানার বিভিন্ন চেষ্টা করেও আমরা অজানার অন্ধকারেই ছিলাম যতদিন না সিগমুণ্ড ফ্রয়েড আমাদের কাছে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনের অজানা দুই প্রকোষ্ঠের (অবচেতন ও অচেতন মন) দ্বারোদ্‌ঘাটন না করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে জানতে কৌতূহলী হয়েছিলেন। তাই ১৯২৬ সালে ২৫শে অক্টোবর ভিয়েনায় থাকতে তিনি একবার ফ্রয়েড এর সাথে দেখা করেন। ফ্রয়েড এর 'The Interpritation Of Dreams' (1900), 'The Unconcious' (1915) প্রভৃতি গ্রন্থে মনোবিশ্লেষণ এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানবমন তিনটি স্তরে বিভক্ত। চেতনা/Concious (চেতনাযুক্ত), অবচেতন/ Pre-Concious (সুপ্ত অবস্থা), নির্জ্ঞান/Unconcious (যা বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায়)। এদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ অনেক সময় এমন কাজ করে থাকে যা তার ভাবনার ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই ফ্রয়েড বলেন মানব চরিত্র ভাসমান হিমশৈলের ন্যায়।

স্বভাবতই এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সাহিত্যেও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে সেই আবহমান কাল থেকে। রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে মানব মনের জটিলতার দিকটি তুলে ধরলেন কথাসাহিত্যে। তাঁর মতে -

> "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তার আঁতের কথা বার করে দেখানো।"[৩]

এই আঁতের কথা আর কিছু নয় চরিত্রের অন্তরমনের বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পটি দক্ষিণাচরণের নির্জ্ঞান স্তরের আপাত সুপ্ত অপরাধবোধের উন্মীলন। নিশীথের বিভীষিকা তার অচেতন ও নির্জ্ঞান স্তরের বিকৃত কল্পনা। 'মণিহারা' গল্পে আছে কিভাবে ও কোন অবস্থাতে একটি মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে তার দ্বিতীয় সত্তা। অবিরত অনুশোচনার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সত্তা থেকে বেরিয়ে আসে দ্বিতীয় সত্তা। তারশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণী ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তার বৌয়ের গলা টিপে ধরে নিজেকে বাঁচিয়েছে। চরম মুহূর্তে মানুষের কাছে নিজের জীবন ছাড়া কিছুই প্রিয়তর নয় লুকানো এ সত্যের সম্মুখীন হয়েছে সে। আবার তারাশঙ্করের 'না' গল্পে শাস্তি দেওয়ার প্রবল তাগিদেও ব্রজরানী তার স্বামীহন্তাকে ক্ষমা করেছে মনের অন্তর্নিহিত বোধের তাড়নায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদপোড়া', 'বিপত্নীক', 'টিকটিকি', 'ফাঁসি' প্রভৃতি গল্পে গল্পকার ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে গল্পরূপে প্রকাশ করেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ছোটোগল্পের রূপ ও রীতিতে অনেক বদল এলেও মনস্তত্ত্ব নানাভাবে গল্পে এসেছে। বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখের গল্পে তার নিদর্শন মেলে। আরও পরবর্তীকালে- অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অনিল ঘড়াই, কিন্নর রায়, নলিনী বেরা প্রমুখের লেখায় নানাভাবে মানবমনের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে।

আলোচ্য গল্পকার প্রচেত গুপ্তের গল্পে মানবমনের গহন প্রদেশের নানা জটিলতা, যন্ত্রণা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নির্বাচিত কিছু গল্পের কাহিনীর আলোচনার মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয়গুলি আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রচেত গুপ্তের অধিকাংশ গল্পের পটভূমি শহরকেন্দ্রিক। এই একবিংশ শতাব্দীর সময়ে সমাজ হয়ে উঠেছে ভয়ংকরভাবে আত্মকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী। মানুষে মানুষে কোনও বিশ্বাস নেই, সম্পর্ক নেই সকলেই যেন আমরা এখন ভিন গ্রহের বাসিন্দা। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষ ভীষণ ভাবে হতাশাগ্রস্ত অবসাদে বিপর্যস্ত। প্রচেত গুপ্তের গল্পের চরিত্র গুলিকেও দেখা যায় তারা এ পরিস্থিতির শিকার, যেখানে মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকারত্ব, জীবনে শুধু প্রতিযোগিতা ও বস্তুবাদের আধিপত্য। এর দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে জড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রচেত গুপ্তের এমনই এক ছোটগল্প হল 'ফ্লাইওভার'। সভ্যতার করাল গ্রাসের প্রতীক ফ্লাইওভার নবনী ও তথাগতর ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। আধুনিক সভ্যতার চিহ্নবাহী দশতলার বিল্ডিং এ ফ্ল্যাট তাদের যা নাকি এখন 'স্টাইল'। কিন্তু নবনীর ইচ্ছা ছিল উঁচু জানলা থেকে গাছপালা দেখার বেডরুমের পাশ দিয়ে যাওয়া ফ্লাইওভারকে সে শুরু থেকে পছন্দ করতে পারেনি। তথাগতর কথায়-

> "এটা একটা আধুনিক বিষয়। একটা ডেভলপমেন্ট। তুমি সেটার পার্ট হচ্ছ। ... চোখের সামনে সারাক্ষণ গাড়ি ছুটবে। মনে হবে ছুটছে না উড়ছে। একটা সময় ইউ ক্যান ফিল দ্যাট স্পিড।"[৪]

কিন্তু নবনী এই ফ্লাইওভার এর ওপর জীবন্ত সত্তা আরোপ করেছে। কখনও সেটা নড়ে উঠেছে, কখনও নিশ্বাস ফেলেছে, চাপা অথচ গম্ভীর। বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে ফ্লাইওভার যেন বিকট চেহারা নিয়ে আক্রমণ করেছে নবনীকে-

> "চ্যাপ্টা মুখ পিচের মত ঝকঝকে কালো ও মসৃণ ছোট ছোট চোখ দুটো কংক্রিটের মত কঠিন নিষ্প্রাণ তবু যেন জ্বলছে।"[৫]

তার জিভ যেন সাপের মত চেরা। আসলে ইট কাঠ পাথরের রাস্তার দমচাপা অনুভূতিতে পিষ্ট হয়ে অবচেতন মনে জন্ম নিয়ছে ভয়। গল্পে ডাক্তারের কথায়-

> "অনেক সময় এরকম হয়। যা দেখে ভয় পাওয়ার নয় তাই দেখেও মানুষ ভয় পায়।"[৬]

ব্যক্তিমনের এ অহেতুক ভয়কে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফোবিয়া, যা এ গল্পে ফ্লাইওভারকে কেন্দ্র করে নবনী ও তথাগতর মনে দেখা যায়। গল্প শেষে তথাগতর এ ভয় দেখা যায় ঘুম ভেঙে যখন সে কংক্রিটের ভারী শরীর নিয়ে চলার আওয়াজ অনুভব করে। আধুনিক সভ্যতার এ পরিণামকে প্রয়োজনের খাতিরে মেনে নিলেও মন থেকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায়না তাই মনের অন্দরে ভয় বাসা বাঁধতে থাকে।

অচেতন মনের নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব অসহায়তায় ভুগতে ভুগতে একটা মানুষ কীভাবে দ্বিতীয় সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে শেষে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে তার উদাহরণ রয়েছে 'মেয়েটা' গল্পে। এই গল্পে সুমিত্রা বারবার তার

স্বামীকে তার অসুবিধা নিরাপত্তাহীনতার কথা বোঝাতে চাইলেও স্বামী প্রদীপ তা ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। ভাড়াটে বাড়িতে নানা অসুবিধা হওয়ায় দুবার স্ত্রীর কথামত বাড়ি বদলালেও সুমিত্রার কথাকে হয় হেসে উড়িয়েছে নয় তাচ্ছিল্য করেছে। সে থেকে সুমিত্রার মনে তৈরি হয়েছে নিঃসঙ্গতা। কোনও বাড়িতে সুমিত্রার পেছনে লোক লেগেছে, কোথাও বাথরুমের ফুটোতে সে দেখতে পেয়েছে 'ঘষা কাচের  চশমাযুক্ত' চোখ। কিন্তু প্রদীপের কথায়-

> "পৃথিবীর সব পুরুষমানুষ শুধু তোমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে?"[৭]

ঘটনার এখানেই শেষ নয়, প্রদীপ বন্ধুর কাছ থেকে অর্ডার পাওয়ার জন্য তার সুন্দরী স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চেয়েছে। এরপর দেখা যায় সুমিত্রা তারই মত অবয়ব বিশিষ্ট একটা মেয়েকে বাড়িতে ঘুরতে দেখেছে, দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও যার অসুবিধা হয় না। মেয়েটির মুখ প্রথমে সে দেখতে পায়না। তবু এ ব্যাপারে স্বামী প্রদীপকে কিছু বলতে চায়না কারণ-

> "প্রদীপ তো আগের ঘটনা গুলোও বিশ্বাস করেনি। এটাতো একেবারেই করবে না।"[৮]

শেষবারে যখন সে মেয়েটাকে দেখে তখন বোঝে আসলে মেয়েটা তার নিজের সত্তা। গায়ে তুঁতে শাড়ি পড়ে সেই মেয়েটার মত সেজে সুমিত্রা রেললাইনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আসলে এর মধ্য দিয়ে সুমিত্রা নিজের অবদমিত একাকীত্ব, অসহায়তাকে মুক্তি দিয়েছে ও নিজে মুক্ত হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের অচেতন প্রক্রিয়া গুলি আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে। সুমিত্রার বিষয়েও তা লক্ষ্য করা যায়।

'কুঞ্জবিহারীর দুঃস্বপ্ন' গল্পে দেখা যায় স্বপ্ন কুঞ্জবিহারীর কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'সামন্ত অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর' কুঞ্জবিহারী সামন্ত 'বাড়াবাড়ি ধরনের ধনী মানুষ।' তবু স্বপ্নে সে নিজেকে দেখেছে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে ও একজন ভিখারী হিসাবে যে তারই গাড়ির সামনে ভিক্ষা পাওয়ার জন্য আসে। ফ্রয়েডের 'স্বপ্নতত্ত্ব' অনুযায়ী– আমাদের ইচ্ছা, কল্পনা, ধারণা ইত্যাদিকে স্বপ্ন বিকৃত করে প্রকাশ করে। কুঞ্জবিহারীর অচেতন মনের লুকিয়ে থাকা নিজের সম্পর্কে ধারণার বিকৃত প্রতিফলন ঘটেছে তার স্বপ্নে। স্বপ্নে দেখা নিজেরই এই ত্রিধা বিভক্ত রূপে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সে ডাক্তারের কাছে ছুটেছে। ডাক্তারের মনে হয়েছে কোনও 'ইনসিকিউরিটি সেন্স' থেকে কুঞ্জবিহারী ধনী থেকে গরীব হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। ডাক্তারবাবু তাকে বিশ্রাম নিতে বলেন, তার স্বপ্ন আর আসেনা কিন্তু দেখা যায় সমস্যার এখানেই শেষ নয়। স্বপ্নে দেখা তার ত্রিধা বিভক্ত সত্তাকে সে নিজের মধ্যে রূপ দিতে শুরু করেছে। তাই গল্পের শেষে দেখা যায়, মুখে পান দিয়ে গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে সে বলছে- ভিখিরি আধবুড়ো টাইপের কাউকে দেখলেই তাকে জানাতে। অর্থাৎ তার নির্জ্ঞান মনের ভাবনায় জাত স্বপ্নে সে এতটাই ডুবে গেছে যে বাস্তবে তাই খুঁজতে চাইছে যা নেই। এই ঘোর থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারেনি ও এর উপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণও নেই।

পরবর্তী আলোচনার গল্প হল 'দিঘি'। এখানে অনেকটা জাদু বাস্তবতার ঢঙে অলৌকিক দিঘির অবতারণা করেছেন লেখক। গল্পের চরিত্র জগন্নাথ তার সাততলা ফ্ল্যাটের উপর থেকে বালিগঞ্জের মোড়ের কাছে একটা বড়সড় দিঘি দেখতে পায় যাতে পানকৌড়ি ডুব মারছে। জাদু বাস্তবতায় অলৌকিক ব্যাপার, অদ্ভুত আবহ, ব্যাখ্যতীত পরিস্থিতি ইত্যাদি আনা হয় বাস্তবকে বোঝানোর জন্য। 'দিঘি' গল্পে তা দেখা যায় জগন্নাথের মনের বাস্তব পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য অলৌকিক দিঘি দেখার মাধ্যমে। ফুটপাথের যেদিকটায় সারিসারি দোকান বাজার, বাড়ি, এটিএম কাউন্টার তার বদলে সেখানে দেখতে পায় একটা দিঘি। জগন্নাথের ফ্ল্যাট এর জন্য নেওয়া লোন, অফিসে প্রমোশনের সমস্যা এসব নিয়ে চাপে থাকার কারণে তার অবচেতন মুক্তির পথ খুঁজছে যার প্রতীক হয়ে উঠেছে দিঘি - জগন্নাথকে একথা বলেছে ডাক্তার। এত সহজেই দেখা যায় অচেতন মনের এ ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি জগন্নাথ। তাই চিকিৎসার পরও মিথ্যে দিঘি না দেখতে পেলেও কাউকে ফ্ল্যাটের ঠিকানা দিতে গিয়ে বলে-

> "ফ্লাইওভারটা পেরোলেই দেখবেন একটা দিঘি। খুব বড়। জল একেবারে টলমল করছে। ওর উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের সাততলায়...।"[৯]

অন্তর্মনের জটিলতায় এতটাই জড়িয়ে গেছে জগন্নাথ তার থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

মানুষের অবদমিত চেতনার অপরাধবোধ তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার উদাহরণ 'নেতা' গল্পটি। বিশিষ্ট নেতা মলিন সরখেল তার নেতা হওয়ার প্রক্রিয়ায় অনেক অপরাধের সিঁড়ি পেরিয়েছেন যা এখনও থামেনি। ব্যবসায়ে টাকা নিয়ে গোলমালের কারণে মলিন তারই সহকর্মী ড্রাগ ও মেয়েছেলে পাচারকারী বলাইয়ের মোটর বাইকে ধাক্কা মেরে তাকে মেরে ফেলেছেন। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ায় বলাইয়ের মৃত্যুতে তার বাড়িতে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মলিন তার বদলে প্রক্সি দিতে বিশ্বনাথকে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। নেতার প্রক্সি দেবে বিশ্বনাথ যার চেহারার সাথে মিল আছে মলিন সরখেলের। পরিবারের সুরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়েছে বিশ্বনাথ এ কাজ করতে। মলিন সরখেলের বদলে বলাইএর বাড়িতে গিয়ে বিশ্বনাথ লোকের বিক্ষোভ ও মারামারিতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। অথচ মলিন সরখেল নিজেকে অপরাধ বোধের ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। তার অস্থির মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তার নিজেরই কথায়-

> "মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এত বড় একটা ভুল করে মাথা ঠাণ্ডা রাখা কঠিন তবু রাখতে হবে।"[১০]

কখনও আবার-

> "হাসপাতালে একটা ফোন করলে কেমন হয়? লোকটা বেঁচে আছে কি?"[১১]

তাই সহকর্মী গণেশ কে নিয়ে পালানোর আগে দরজায় কলিংবেল শুনে যাকে দেখে সে বিশ্বনাথ। মলিন এর মত যার অবয়ব অথচ মুখে রক্তের দাগ। সে এসে জিজ্ঞাসা করে- 'স্যার চিনতে পারছেন?' কিন্তু বাস্তবে বিশ্বনাথ সে সময়ে মৃত। পুলিশ তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নিয়ে ফিরছে। তবুও যে মলিন তাকে দেখতে পেয়েছে তার পেছনে রয়েছে তার মনের অন্তর্নিহিত অপরাধবোধ। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের অধিসত্তা বা Super Ego তৈরি হয় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নৈতিক শিক্ষা থেকে। প্রচলিত ভাষায় আমরা যাকে বিবেক বলি। এই বিবেক বা অধিসত্তা ব্যক্তির নীতি বিরুদ্ধ কাজের সমালোচনা বা নিন্দা করে। অচেতন মনে এর অবস্থান, তাই তার স্বরূপ এর কাছে বেশি স্পষ্ট। মলিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার অচেতন মনের সুপ্ত অপরাধ বোধ তার বিবেককে প্রভাবিত করেছে। তাই অন্তর্নিহিত আত্মঅনুশোচনায় রক্তাক্ত বিশ্বনাথকে সে দেখতে পেয়েছে।

প্রতীক এর সাথে মানবমনের জটিলতার বিষয়টি মিশিয়ে যে গল্প রচনা করেছেন লেখক তা হল 'চেয়ার' গল্পটি। এ গল্পে চেয়ারটি শিবনাথের পরিবারে দারিদ্রতার, টানাটানির সংসারের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

> "প্রতীক বলতে বোঝায় এমন কিছু যার একটা আলাদা অর্থ আছে ব্যঞ্জনা আছে।"[১২]

গল্পে 'চেয়ার' এতটাই ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে উঠেছে যে দেখা যাচ্ছে তাতে কেউ বসলেই জামাকাপড় ছিঁড়তে শুরু করেছে অর্থাৎ পরিবারের দৈন্যদশাকে কোনো ভাবেই আর লুকানো যাচ্ছে না। এ লজ্জা থেকে চরিত্র গুলি অচেতন বস্তুর উপর চেতনা আরোপ করেছে। শিবনাথের নতুন চেয়ার কেনার ক্ষমতা নেই তাই এই চেয়ারটাকে সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। শিবনাথ নিজেই হাতুড়ি, সাঁড়াশি নিয়ে চেয়ারটাকে ঠিক করতে বসেও দেখা যাচ্ছে চেয়ারটার সাথে পেরে উঠছে না। গল্পের শেষে দেখা যায় চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে শিবনাথের মেয়ে ঝুম্পা।

> "নিষ্প্রাণ চেয়ার যেন প্রাণ পেয়েছে। শয়তানের প্রাণ!"[১৩]

এই চেয়ার ঝুম্পাকে ছাড়ছে না। শিবনাথের পরিবারের আর্থিক অনটন, লজ্জা, ভয় সবকিছু মিশে চেয়ারটির ওপর সজীব সত্তা আরোপ করেছে। কঠিন নির্মমভাবে চেয়ারটা যেন ব্যঙ্গের হাসি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে।

মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার আর একটি গল্প হল 'মৃত'। বাঁধন তার সদ্যবিবাহিত জীবনে স্বামী অতীশকে 'মৃত' ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত। গল্পে দেখা যায় বাঁধন শুরু থেকেই ভীতু স্বভাবের ছোট ছোট বিষয়েও ভয় পায়। তার কাছে স্বামী অতীশ যেন রহস্যে মোড়া। সারাদিন অফিসের কাজ কর্ম নিয়ে ব্যাস্ত ও রাতে বিছানায় পড়লেই পাশ ফিরে ঘুম। ঘুমন্ত স্বামীকে বাঁধনের কখনও মনে হয়-

> "অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষটাকে মনে হচ্ছে ছায়া, মাথা, হাত, পা পিঠ সব ছায়া।"[১৪]

আবার কখনও মনে হয় –

> "ওপাশ ফিরে শুয়ে থাকা মানুষটা ঘুমিয়ে নেই মানুষটা মরে আছে! সাড়াহীন, স্পন্দনহীন, শ্বাস প্রশ্বাসহীন একটা মরা মানুষ শুয়ে আছে পাশে!"[১৫]

আরেক দিন বাঁধনের মনে হয়েছে –

"মণিগুলো স্থির। মৃত মানুষের নিথর মণি।"[১৬]

অথচ সারাদিন তার স্বামী কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এসবকিছু বোঝা যায় না। বিষয়টা শুধু মাত্র বাঁধনের মনের ভুল বা আতঙ্ক নয় এর মূল নিহিত আছে অনেক গভীরে। অতীশ চরিত্রটি প্রথম থেকেই রহস্যময়। সে নিজে মেয়ে দেখতে এসেছে বাঁধনের বাড়িতে খবর না দিয়ে হুট করে, কাজের ফাঁকে। বাড়িতে কেউ নেই অতীশের, বাবা মা মরেছে ছেলেবেলায়। আত্মীয় শুধু এক দূর সম্পর্কের পিসি। বিয়ে করেছে শুধু রেজিস্ট্রি। বয়সে বাঁধনের থেকে অনেক বড় অতীশ তার কথা অনুযায়ী এতোদিন বিয়ে করেনি কাজের জন্য সময় পায়নি বলে। ফুলশয্যার রাতে বিছানায় কোনও ফুল দেয়নি কারণ ফুলের গন্ধে তার মাথা ঘোরে। আসলে তার একাকী জীবনে কাজে থাকতে থাকতে সে কাজের, প্রয়োজনের মানুষ হয়ে উঠেছে। তার মন, অনুভূতি এসব যেন মৃত, আসলে তার সত্তা মৃত। অতীশ বাঁধনকে বলেছে –

"তোমাদের অভ্যেস আলো। আমার অভ্যেস অন্ধকার।"[১৭]

তার এই মৃত সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় রাতে ঘুমানোর সময় তাই বাঁধন তা দেখে ভয় পায়। গল্পে একজায়গায় অতীশের এই সত্তার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় ইঙ্গিতে বাঁধনের ভাই অঙ্কুরের কথায় –

"দিদির তো পাথরের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না।"[১৮]

গল্প শেষে বাঁধনের পিতা প্রমথবাবুর অতীশের এই মৃত সত্তার সাথে পরিচয় ঘটে।

পরবর্তী গল্প 'পুঁইশাক' যেখানে লেখক ব্যঞ্জনার সাথে মানবমনের জটিলতার দিকটি তুলে ধরেছেন। গল্পের 'পুঁইশাক' নামটি ব্যঞ্জনাবাহী, রিভলভার বোঝাতে ব্যাবহার হয়েছে। প্রলয় সমাদ্দার প্রাইভেট কোম্পানিতে ছোটপদে চাকরিরত। অফিসের অবস্থা ভাল নয়, অর্ডার কমেছে কয়েকজন পিয়নকে চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এসবের প্রভাব পড়েছে প্রলয়বাবুর জীবনে, সংসারে অভাবে অনটনে পড়তে হয়েছে। বাজারের ব্যাগ দেখে মনে হয়েছে তার বহুদিন ভরা বাজার নিয়ে পিঠ সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি বলে লজ্জা পেয়েছে। আসলে এ লজ্জা প্রলয়বাবুর। তিনি ভাবেন একটা বয়সের পর জীবনে উচিত কথার কোনও দাম নেই, দাম আছে শান্তির। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে তার চরিত্রে নীতি, শৃঙ্খলার বিষয় গুলোর অবদমন ঘটছে, আপোস ঘটছে। তাই বাজারের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে প্রলয়বাবুর মনে হয় তাতে রয়েছে ঠাণ্ডা শক্ত কোনও জিনিস, যেমন শক্ত হয় লোহা পিতল। এ অনুভব রিভলভার বা বন্দুকের অনুভব। সমাজ পরিস্থিতির চাপে তার ব্যক্তি মনের যে অবদমন তা থেকে রক্ষা পেতে উচিত কথা বলার অস্ত্র হিসাবে তিনি রিভলভার পেতে চান অথচ বাস্তবে তা অসম্ভব। তাই এই ভাবনা বার বার ফিরে এসেছে। গল্পের শেষে দেখা যায় প্রলয়বাবুর অফিসের কলিগ নীতিশ এর শ্যালকের বাজারের ব্যাগে রিভলভার পাওয়া গেছে যা পুঁইশাক দিয়ে মোড়া ছিল। প্রলয়বাবুও বাজার করতে গিয়ে অন্য তরকারির সাথে কিছুটা পুঁইশাক এনেছেন। রিভলভার না আনতে পেরে পুঁইশাক এনে মনের খেদ যেন মিটিয়েছেন। আসলে অচেতন মনের ইদ (ID) অনুসরণ করে সুখ ভোগের নীতি দুঃখকে এড়িয়ে চলে। সমাজ শিক্ষা নীতির ধার ধরে না। গল্পে সামাজিক পারিবারিক চাপে প্রলয়বাবু এ ধারণার বশবর্তী হয়েছেন।

মনের অনিয়ন্ত্রিত প্রভাবের এক নিদর্শন 'চাপা' গল্পটি। সাজানো গোছানো সংসারে ছতলার ফ্ল্যাটে স্ত্রী ও মেয়ে নিয়ে বাস প্রতীকের। অথচ রাতে গাড়ি চালিয়ে পথে সে কাউকে চাপা দিয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এই ভাবনায় প্রতীক অস্বস্তিতে পড়েছে। কোনোভাবেই নিজেকে সামলাতে পারেনি। ফুরফুরে মেজাজে নিউটাউনের রাস্তা ধরে গাড়িতে স্পিড তুলে সারা রাস্তা শেষে বাড়ির কাছাকাছি এসে তার মনে হয়েছে পথে সে কাউকে চাপা দেয়নি তো বা ধাক্কা মারেনি তো? এ বোধের পেছনে তার যে যে যুক্তি কাজ করেছে –

১. চালকের মধ্যে যে টানটান ভাবটা থাকা দরকার তার বিন্দু মাত্র ছিল না, ২. সবসময় রাস্তার ওপর নজর রাখতে পেরেছে এমন নয়, ৩. ঘটনা কিছু ঘটেছে বলেই তার এরকম মনে হচ্ছে। এসব ভেবে সে গাড়ি ঘুড়িয়ে রাস্তায় খুঁজতে বেরিয়েছে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা। এই ভাবনা থেকে প্রতীক নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারেনি। কখনও তার মনে হয়েছে –

"এটা কি কোনও অসুখ? হঠাৎ করে তাকে চেপে ধরল?"[১৯]

আবার –

> "কেন যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে মনকে শান্ত করতে পারছে না?"[২০]

সারারাস্তা গাড়ি নিয়ে ঘুরে কাউকে রাস্তায় পড়ে থাকতে না দেখে তার ফুরফুরে মেজাজ ফিরে এল কিন্তু এ ভাবনা কিছুক্ষণের জন্যই। তাই গল্প শেষে দেখা যায় পার্কিং এ গাড়ি রেখে তার উপর চোখ পড়তেই সে দাগটা দেখতে পায়। দাগটা রক্তের। এখানেই গল্প শেষ। বাস্তবে এ দাগটা নেই তা প্রতীকের মনের ভুল যা এতক্ষণ তাকে বাধ্য করেছে, চালিত করেছে ও শেষ পর্যন্ত সে দাগটা কল্পনা করেছে। প্রতীকের এ ধরনের আচরণের সমর্থন রয়েছে মনোবিজ্ঞানে – যেখানে ব্যক্তি এমন কোন চিন্তা করতে বাধ্য হয় যা সে চিন্তা করতে চায় না বা এমন কোন কাজ করতে বাধ্য হয় যা সে সম্পন্ন করতে চায় না নিজের আচরণের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারলেও ঐ চিন্তা বা কাজ না করে পারে না। প্রতীকের ক্ষেত্রে তা ঘটতে দেখা যায়।

অচেতন মনের চিন্তা ও অনুভূতি থেকে একজন মানুষ কিভাবে নিজের অজান্তেই অন্য একজন মানুষ হয়ে ওঠে তার পরিচয় রয়েছে 'শ্রাবণের হানিমুন' গল্পটিতে। নীলাদ্রি ও শ্রীময়ী বিয়ের পর হানিমুনে সমুদ্র দেখতে গেছে। নির্জনে থাকার জন্য হোটেলে চারতলার হানিমুন স্যুইট বুক করেছে তারা। আপাত স্বাভাবিক এ ঘটনায় অস্বাভাবিকতা দানা বাঁধতে শুরু করে যখন দেখা যায় হোটেলে পৌঁছে বেয়ারার কাছে গল্প করে শ্রীময়ী জানতে পেরেছে ঠিক তাদের পাশের হানিমুন স্যুইটে এক ভদ্রলোক দীর্ঘ ১০-১২ বছর ধরে একা আসে তার মৃত স্ত্রীর অপেক্ষায়। এই ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী প্রথমবার হানিমুন করতে এই হোটেলে এসেছিল। তারপর বছরখানেকের মাথায় স্ত্রী মারা যায়। এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়ম করে লোকটা একা একা আসে। শ্রীময়ী এ ঘটনা শুনে এতটাই আকর্ষিত হয়েছে যে বার বার নীলাদ্রির কাছে এই লোকটার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। নীলাদ্রি বিরক্ত হলেও শ্রীময়ী নিজে কেমন উদাস হয়ে গেছে। অথচ নীলাদ্রির এই লোকটার মরা বউয়ের ধ্যান করার বিষয়টা পছন্দ হয়নি। শ্রীময়ী নীলাদ্রির কাছে জানতে চেয়েছে সে মরে গেলে কি নীলাদ্রিও এভাবে আসবে? স্বামীর ঠাট্টা, যুক্তি কিছুই শ্রীময়ীর পছন্দ হয়নি। নীলাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করেছে সে –

> "বউ পাগল লোকটা তো আসে, কিন্তু ওর মরা বউও আসে?"[২১]

বউ মরা লোকটার সম্পর্কিত ভাবনায় এতটাই জড়িয়ে যায় শ্রীময়ী যে কল্পনায় নিজেই লোকটার মরা বউ হয়ে তার কাছে পৌঁছে গেছে। তাই গভীর রাতে ঘুম ভেঙে পাশের ঘরে মেয়ের গলার ফিসফিসানি শুনতে পেয়েছে শ্রীময়ী, যে গলা তার নিজের। আসলে ভালোবাসার এই বিরাটরূপের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায়, আকর্ষণে সে নিজে ঐ জায়গাটা পেতে চেয়েছে। তার অবচেতন মনের এ ভাবনা আরও গভীরে অচেতনায় প্রবেশ করে তাকে এমন কল্পনা করতে যেন বাধ্য করেছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন গল্পে মানবমনের দোলাচলতার দিকটি তুলে ধরেছেন লেখক।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ও একবিংশ শতাব্দীর শুরু এসময়ে ছোটগল্প আরও পরিবর্তিত হয়েছে।গল্পকার উমা মাঝি মুখোপাধ্যায়ের কথায় –

> "ছেড়ে যাওয়া শতাব্দীর থেকে নতুন একটা বন্দরে ভিড়তে থাকা শতাব্দীর দূরত্ব অনেক। এক বিশ্বাসের চাদর ছিঁড়ে আর এক বিশ্বাসের উপকূলে উপনীত হওয়ার দূরত্ব অনেক।"[২২]

– এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেসকল গল্পকারেরা গল্প লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কিন্নর রায় এর গল্পে এসেছে জাদু বাস্তবতা, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে এসেছে মার খাওয়া মানুষদের কথা, অনিল ঘড়াই এর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে অসহায় মানুষের যন্ত্রণা ও প্রতিবাদ, নলিনী বেরার গল্পে নিচুতলার মানুষদের কাহিনী আরও পরবর্তীকালে তিলোত্তমা মজুমদার এর গল্পে রয়েছে ভাষার অনবদ্য প্রকাশ। তাঁর গল্পে সংলাপ পদ্ধতির ব্যবহার রসময়তাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেনি। এ সময় পর্বের গল্পকার প্রচেত গুপ্ত তাঁর সমসাময়িকদের থেকে যেখানে ভিন্ন তা হল তাঁর প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতা। নিতান্ত সহজ সরল ভঙ্গিতে, সহজ সরল উপাদান ব্যবহার করে তিনি মানব মনের অন্তর্জগতের কাহিনীর উন্মোচন ঘটিয়েছেন। তাঁর গল্পের ভাষা এত অনাড়ম্বর যে তা পাঠককে ক্লান্ত করে না গল্প পাঠে অভিধানের সাহায্য নিতে হয় না। তাঁর আয়োজন স্বল্প কিন্তু বক্তব্য গভীর ও দৃঢ়। লেখকের নিজের কথায় –

> "শুধু গদ্য নয়, সব বড় সৃষ্টিরই নিজস্ব ভাবনা, ভঙ্গি, প্রকাশ থাকতে হয়। লেখার তো বটেই। একজন লেখক জীবন দর্শনকে নিজের মত প্রকাশ করার জন্যই তো লেখেন।"[২৩]

এখানেই তিনি অনন্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, গল্পকার প্রচেত গুপ্ত তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পের মাধ্যমে মানবমনের অজানা দিকটি তার প্রভাব ও রহস্যময়তাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পাঠককে এ বোধের জগতে নিয়ে গেছেন যে আমরা নিজেকে যা জানি আসলে আমরা সবটা তা নয়। চেতনা যেমন সত্য তেমনি সত্য অচেতনা ও তার প্রভাব। এক সাক্ষাৎকার এ প্রচেত গুপ্ত বলেছেন –

> "আসলে সাহিত্যকর্ম একটা ম্যারাথন দৌড়। একজন অন্যজনের হাতে মশাল তুলে দেন। সেই মশাল তার বোধের, উপলব্ধির।"[২৪]

এই উপলব্ধির মশাল পাঠকের কাছে তুলে দিয়েছেন লেখক নিজেও।

**তথ্যসূত্র :**

১. দাশ, জীবনানন্দ, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বোধ', প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, প্রথম সিগনেট সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬৩ পৃ. ৪২
২. গুপ্ত, প্রচেত, 'প্রচেত গুপ্তর গল্প', লেখকের নিবেদন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩ পৃ. ০৯
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চোখের বালি', সূচনা, ইউনাইটেড পাবলিশার্স ৭৭এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০০৯, ১৯০৩ পৃ. ০৪
৪. গুপ্ত, প্রচেত, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা– ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১০ পৃ. ২৯
৫. তদেব, পৃ. ৩২
৬. তদেব, পৃ. ৩২
৭. তদেব, পৃ. ১২৫
৮. তদেব, পৃ. ১২৭
৯. তদেব, পৃ. ২২৩
১০. তদেব, পৃ. ২৩২
১১. তদেব, পৃ. ২৩৩
১২. সেন, নবেন্দু, 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', রত্নাবলী ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০০৯ পৃ. ২৯৮
১৩. গুপ্ত, প্রচেত, 'পঞ্চাশটি গল্প' আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৭০০০০৯ প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০১০ পৃ. ২৪৭
১৪. তদেব, পৃ. ২৮৭
১৫. তদেব, পৃ. ২৯০
১৬. তদেব, পৃ. ২৯২
১৭. তদেব, পৃ. ২৯০
১৮. তদেব, পৃ. ২৮৬
১৯. তদেব, পৃ. ৩২৮
২০. তদেব, পৃ. ৩২৮
২১. তদেব, পৃ. ৪৩৪

২২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ আশ্বিন ১৪১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ পৃ. ৫৫১

২৩. যুগান্তর, ই পেপার, 'তাহলে তো শেকসপিয়রের সব নাটক ফেলে দেওয়া উচিত', প্রচেত গুপ্ত, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯, ১২:০০ এ.এম, www.jugantor.com

২৪. যুগান্তর, ই পেপার, 'তাহলে তো শেকসপিয়রের সব নাটক ফেলে দেওয়া উচিত', প্রচেত গুপ্ত, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯, ১২:০০ এ.এম, www.jugantor.com

**গ্রন্থপঞ্জি :**

১. সরকার সুনীলকুমার, 'ফ্রয়েড' (Freud: Life and Psychoanalysis), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-৭০০০৮৫, তৃতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৫৯, পৃ. ০১, ২১

২. ঘোষ অরুণ, 'অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান', এডুকেশনার এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-৭০০০১৯ প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৬০ পৃ. ১৪৫, ১২৩

৩. চট্টোপাধ্যায় সত্যচরণ, 'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ', কলকাতা-৭০০০০৯ দ্বিতীয় সংস্করণ বইমেলা ২০০৮ পৃ. ৫৪, ৭০